তারিখ 17 JUL 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

৩২শে আষাঢ় ১৩৯৪ বাং

নগর দর্পণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমি দুঃখিত হয়েছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমি খুশি হয়েছি। দুঃখিত হয়েছি এই কারণে যে আমার ছেলেটি ১৯৮২ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় পাস করেছে। এখন সে মাত্র থার্ড ইয়ারে উঠেছে। কবে অনার্স পাস করে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রী নিয়ে বের হবে, কিছুই বলতে পারি না। আমার জীবৎকালে ছেলেটি আদৌ এমএ পাস করে বের হবার সুযোগ পাবে কিনা, সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমি খুশি হয়েছি এই কারণে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছেলের নিরাপত্তার কথা ভেবে সারাদিন আমাকে উৎকণ্ঠিত থাকতে হবে না। রোজ সকালে ও যখন ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করতে যায়, আমি দারুণ ভয়ে ভয়ে থাকি। আশংকা হয় এই বুঝি গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। ছেলেটির ফিরতে দেরী হলে আর কিছুতেই কোন কাজে মন বসাতে পারি না। আমার ছেলে বাসায় না ফেরা পর্যন্ত আমি আর স্থির হতে পারি না। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমাকে এখন আর ভাবতে হচেছ না। শুধু আমাকেই নয়, এদেশের হাজার হাজার অভিভাবককেও আর ভাবতে হচেছ না। কিন্তু সত্যি কি ভাবতে হচেছ না ?। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়ে যারা তিন/চার বছর পিছিয়ে গেছে, সেইসব ছেলেমেয়েদের কথা না ভেবে কোন উপায় কি আছে ?

ক্যাম্পাস এখন নিরব, নিস্তব্ধ। যে ভবন, যে অঙ্গন শত সহস্র তরুণ-তরুণীর কলধ্বনিতে মুখরিত হত, সেখানে এখন ঘাসের ওপর বাতাস খেলে যায়, পাখি ডাকে কিনা, বলতে পারি না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, গত বুধবারের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে আর কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। ক্যাম্পাসে এই নিস্তব্ধতা যে প্রীতিকর দৃশ্য, সেও বলতে পারি না। যেখানে বই-খাতা হাতে হাস্যোজ্জ্বল প্রাণোচ্ছল তরুণ-তরুণীর মেলা হওয়ার কথা, সেখানে বিরান প্রান্তরে স্তব্ধতা কি প্রীতিকর ?

কিন্তু ভাবনায় তো বিপত্তি ঠেকে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারও রক্তপাত ঘটল। দুজন ছাত্র মারা গেল। একজন মাথায় বুলেটের জখম নিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। একজন রিকশাচালক ক্যাম্পাস থেকে ছিটকে আসা গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে। কেন এই মৃত্যু, কেন এই রক্তপাত, বুঝতে পারি না। কোন আদর্শের জন্য বলি হচেছ তরুণরা, কোন আদর্শের জন্য এই রক্তপাত ?

খবরের কাগজে বিভিন্ন মহলের বিবৃতি পড়েছি, ছবি দেখেছি। বোমা, গুলি, অস্ত্রের ছবি বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্র নিয়ে হানাহানির ছবি, অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে সংবাদপত্রের স্তম্ভ ভরে উঠেছে, কিন্তু কারও অভিযোগেই বুঝতে পারলাম না, কোন আদর্শের জন্যে, কোন মহৎ রাজনীতির জন্যে তরুণের প্রাণ বলি হবে। কী কারণে শত সহস্র জীবন থেকে এমন করে জীবনের মূল্যবান বছরগুলি হারিয়ে যাচেছ ?

এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাসের দিকে যদি ফিরে তাকাই, তখন আজকের ক্যাম্পাসের এ বিশৃংখলা মনকে আরও বেদনার্ত করে তোলে। যুগে যুগে তরুণরাই এদেশে বিদ্রোহের পতাকা তুলেছে। তরুণরাই পথে রক্ত ঢেলে ইতিহাস বদলেছে। আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে এই হানাহানি, এই রক্তপাত, এই প্রাণদান উপলক্ষ করে ইতিহাসের কেমন জয় স্তম্ভ উঠবে, জানি না। আমাদেরই সন্তানদের কেউ কেউ কেন অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে, কেন একে অন্যকে হত্যা করছে, বলতে পারি না। বলতে পারি না, ঠিক তাও নয়। এই উৎক্ষিপ্ত, এই অস্থির শুষ্ক নোঙরহীন এই দিক নির্দেশহীন সমাজের যাবতীয় পাপের বোঝা বুঝি তাদের কাঁধেই চেপেছে। ছাত্রছাত্রীরা রাজনীতির কামানের খোরাক, তারা প্রাণ দিচেছ, তারা প্রাণ নিচেছ। আর কে যে কোথায় বসে কী ফায়দা তুলছে, তারাও জানেন না, আমরাও বুঝতে পারি না। শুধু হৃৎপিন্ড হাতে নিয়ে ভাবি, তরুণদের এভাবে কি মৃত্যুর মুখে, ধ্বংসের মুখে, অসার্থকতার মুখে ঠেলে দেয়া হবে ?

জোয়ান অব আর্ক নাটকের সমাপ্তিতে বার্নার্ড শ প্রশ্ন রেখেছিলেন, 'গড, দাও মেইডেস্ট দিস বিউটিফুল আর্থ। হোয়েন উইল ইট বি রেডি টু রিসিভ দাই সেইন্টস ? হাউ লং, ও লর্ড, হাউ লং ?' আজ আমাদেরও প্রশ্ন করতে ইচেছ করে, হাউ লং, ও লর্ড, হাউ লং ? হে বিধাতা, কবে আর কবে, আর কোন দিন শিক্ষাঙ্গন শিক্ষার্থীদের জন্যে নিরাপদ হয়ে উঠবে ?

ঢাকাই লিমারিক

হরেক রকম তালের শহর এই যে মোহন ঢাকায়
কান্না-হাসি কখন এসে শিকড় ধরে ঝাঁকায়,
কখন বাঁচি, কখন মরি,
কখন ছাড়ি কখন ধরি
বলতে কিছুই পারি না যে এমন শহর ঢাকায়।

হরতাল

গত সপ্তাহের বেশ কয়েকটা দিন হরতালের ভেতর দিয়ে পার হয়ে গেল। যানবাহন, দোকানপাট ব্যাংক, অফিস বন্ধ কিংবা প্রায়-বন্ধ। রাস্তায় পায়ে চলা মানুষের ভিড়। ছোটরা মহানন্দে ফুটবল খেলেছে রাজপথের ওপর বয়স্করা যানবাহন নেই জেনেও রাস্তা পেরোতে গিয়ে অভ্যাসের বশে ট্রাফিকের লাল-সবুজ আলো আর ডাইনে-বাঁয়ে তাকিয়েছেন। কাঁচা বাজারের অর্ধ-খোলা দোকান থেকে কেউবা চট করে কিনে নিয়েছে পেঁয়াজ, ডাল আলু, ডিম ইত্যাদি সামগ্রী।

হরতাল এখন এক রকম আমাদের ধাতে সয়ে গেছে বলা যায়। হরতালের দিনগুলি কেমন হবে ঠিক বলে দেয়া যায়। ভোর বেলা জানালা দিয়ে সবাই তাকাবে, পথে বাস, রিকশা নেমেছে কিনা। বাস-রিকশা না দেখলে বুঝতে হবে, কমপ্লিট হরতাল। তারপর একটা মন্থর দিনের জন্যে প্রস্তুতি। আস্তে আস্তে কর্মস্থলের জন্য তৈরি হওয়া। পায়ে হেঁটে অফিসে রওয়ানা দেয়া। তারপর পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরা। মাঝে মাঝে খোঁজ নেয়া, কোথায়ও কিছু ঘটেছে কি ? ঢাকা শহর এখন অনেক বড় হয়েছে। এক এলাকার খবর সহজে অন্য এলাকায় পৌঁছে না। টোকাইরা যানবাহন আর আজকাল ধরতে পরে না। পত্রিকায় হরতালের খবর শুনে সবাই যানবাহন গ্যারেজে তুলে রাখে। সুতরাং টোকাইরা রাস্তায় পুরনো টায়ারে আগুন দিয়ে উৎসব জমায়। আর দূর থেকে সেই ধোঁয়া দেখে নগরীর স্থিতিশীল বাশিন্দারা উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে. এই বুঝি লাগল।

হরতাল নিয়ে এখন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় অনেক বাদ-প্রতিবাদ। যারা হরতাল করেন, তাদের এক বক্তব্য, যারা হরতালের বিরোধী তাদের আর এক বক্তব্য। এই দুই প্রান্তের মধ্যে কোনদিন মিল ঘটবে, এমন মনে হয় না। শুধু জনসাধারণই বলতে পারে কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল। তবে জনসাধারণ কিন্তু ঠিকই তাদের কথা বলেন, আমরা সবাই শুনতে পাইনা, এই যা মুশকিল।

হরতালের সময় নিশ্চয়ই অনেক কিছু হয়, সে প্রসঙ্গ এখানে আলোচ্য নয়। হরতালের একটি অরাজনৈতিক দিক হচেছ সেদিন গোটা নগরীতে আশ্চর্য এক শব্দহীনতা বিরাজ করে। মানুষের শ্রবণ শব্দের অত্যাচার থেকে মুক্তি পায়। পুরনো ঝরঝরে বাস, বীভৎস ট্রাক, ভাঙ্গাচোরা স্কুটার—এই নগরীতে তাদের প্রাণ ফাটানো অর্কেস্ট্রা বাজাতে পারে না। কান পাতলে বুঝি পাখির শব্দ শোনা যায়। বাতাসের শব্দ শোনা যায়। হরতালের স্তব্ধ প্রহরে এ বিশাল নগরীতে মানুষ কখনওবা নিজের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। জীবিকার পেছনে ছুটতে ছুটতে উদভ্রান্ত মানুষ হরতালের বিরতিতে পথ হাঁটতে হাঁটতে সাত পাঁচ ভাবার সুযোগ পায়। হয়ত ফিরে আসে পথ-হাঁটার কৈশোর, গ্রামের পথ, যানবাহনের নিপীড়নমুক্ত পরিবেশ।

ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত

ক্যাম্পাসে গুলি, মৃত্যু, হরতাল, রাজনীতি ঘেরাও—এসবের বাইরে কিংবা এসবের মধ্যে এ নগরীতে কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনধারা তার আপন খাতে চিরকাল প্রবাহিত। সে জীবনে বাইরের তরঙ্গ অবশ্যই দোলা দেয়, সে জীবনকে প্রভাবিত করে, কিন্তু এর মাঝেও আপন দুঃখ, আপন বেদনা, আপন স্বপ্ন, আপন উৎকণ্ঠা অনুভূতি মানুষকে পুরনো নিয়মে দোলায়িত করতে থাকে। কান্না হাসির দোল-দোলানো জীবনের যে পালা যেখানে মৃত্যু বিরহ, ভাবনা, উদ্বেগ, প্রতীক্ষা কিংবা সুখ হাসি জীবনকে আবৃত করে রাখে। মৃত্যুকে আঁকড়ে ধরে জীবন থমকে দাঁড়ায়। অশ্রুকণা অতিক্রম করে জীবন আবার প্রবাহিত হয়। ধ্বংস আর দুঃখের মুখে দাঁড়িয়েও আমরা আবার বেঁচে থাকি, মুদির দোকানে চাল ডালের সন্ধান করি, ঘাড় গুঁজে কাজ চালিয়ে যাই।

ব্যক্তিগত আর সমষ্টিগত জীবনের মধ্যে বিরোধ নেই, কিন্তু পার্থক্য আছে। সমষ্টির ভিড়ে আমরা ব্যক্তি জীবনকে কখনওবা বিস্মৃত হই কিংবা লুকিয়ে রাখি। আবার ব্যক্তি জীবনকে বাদ দিয়ে আমরা সমষ্টির স্রোতেও ভেসে যেতে পারি না।

পাদটীকা

বিশ্বের সবচাইতে ধনাঢ্য ব্যক্তির বাস জাপানে শুনে মন্তব্য করলেন জনৈক নাগরিক : 'আমাকে জাপানেই যেতে হবে।' কেন জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই তার কাছে কিছু ইয়েন কর্জ পাওয়া যাবে।'

—সুপান্থ